



মহাবিহার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



মহাবিহার

সূচিপত্র

মহাবিহার.....	2
---------------	---

মহাবিহার

বিদায় অনুষ্ঠানেও শীলাবতীর অভ্যস্ত সংযম আর গান্ধীর্ষের ব্যতিক্রম দেখল না কেউ। মেয়েরা তাঁকে ভক্তি করত এবং ভয় করত। শিক্ষয়িত্রীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভয় করতেন। এই চিরাচরিত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় কাটিয়ে শেষ বিদায়ের দিনেও কারো পক্ষে তাঁর খুব কাছে আসা হল না যেন সকলের কাছে থেকেও শীলাবতী যেমন দূরে ছিলেন, তেমনি দূরেই থেকে গেলেন।

অল্প দু-চার কথায় স্কুলের উন্নতি কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন শীলাবতী। তাঁর বয়স চুয়ান্ন সরকারি বিধি অনুযায়ী আরো এক বছর স্বচ্ছন্দে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে বহাল থাকতে পারতেন। সরকারি চাকরির মেয়াদ আরো তিন বছর, অর্থাৎ আটান্ন পর্যন্ত টানার জল্পনা-কল্পনা চলছে, এই একবছরের মধ্যে সেই নির্দেশও হয়ত এসে যেত। মোটমোট আরো চারটে বছর অনায়াসে স্কুলের সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারতেন শীলাবতী। এই দীর্ঘকাল ধরে যেমন ছিলেন।

কিন্তু স্বেচ্ছায়, বলতে গেলে, তদবির তদারক করেই অবসর গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর স্বাস্থ্য টিকছে না। স্কুলের এতবড় দায়িত্বভার বহন করতে তিনি অক্ষম।

এই বয়সেও তাঁর শরীরের বাঁধুনি দেখলে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে কেউ বলবে না। চুয়ান্নকে অনায়াসে চুয়াল্লিশ বলে চালানো যায়। অবশ্য তাঁর হার্টের রোগ, বাইরে থেকে তাই অসুস্থতার ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায় না। আর রাতে যে ভালো করে ঘুম হয় না, সেটা বাড়ির দুই একজন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেউ টের পায় না। স্কুলে যখন আসেন, তাঁর ধীর-স্থির গান্ধীর্ষের আড়ালে সব ক্লান্তি ঢাকা পড়ে যায়।

শুভার্থীজনেরা পরামর্শ দিতে এসেছিলেন, একেবারে অবসর নেবার দরকার কি, লম্বা ছুটি নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে গেলেই তো হয়, এক বরাদ্দ ছুটি ছাড়া আর কখনো কোনো ছুটিই তো শীলাবতী নেননি।

শীলাবতী মাথা নেড়েছেন। জীবনভোর তো শুধু চাকরিই করলেন। চাকরি আর নয়। এবারে বাধা-বন্ধনশূন্য ছুটি।

যে মহিলা আজীবন বিরামশূন্য কর্তব্যের মধ্যে ডুবে রইলেন, আত্মীয় পরিজনবিহীন এই ছুটি তাঁর ক্ষতি করবে বলেই অনেকের ধারণা সময় কাটবে কি করে, আদর্শপ্রাণা মহিলা কি নিয়ে থাকবেন এর পরে?

কিন্তু বিদায় নেবার পরমুহূর্ত থেকে কেউ তাঁকে দেখলে অবাক হতেন টাঙ্গা করে একা বাড়ি ফিরছেন তিনি সামনের আসনে বিদায়ী মালার বোঝা শীলাবতী আপন মনে হাসছেন মৃদু মৃদু। কে তাঁকে কটা দিন হাসতে দেখেছে আপন মনে? ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। চাকরি জীবনের সব আকর্ষণ, কর্তৃত্বের মোহ, কর্তব্যের শেকল—সব ওই কণ্ঠত মালাগুলোর মতো জীবন থেকে খসে গেছে। এই মায়া কাটানোর জন্যে দীর্ঘকাল ধরে অনেক যুঝতে হয়েছে তাঁকে, অনেক বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হয়েছে। ওরা জানে না, জীবনে এই প্রথম সুখের মুখ দেখতে চলেছেন শীলাবতী

দেখতে দেখতে এই দিনটা কাটবে। এক ঘুমে এই রাত কাটবো সকালের ট্রেন ধরবেন তিনি। তারপর দেড়শ মাইল পথ ফুরোতে আর কতক্ষণ? শীলাবতীর আনন্দে ভরপুর চোখের সামনে দেড়শো মাইল দূরের সেই শান্ত স্নিগ্ধ মহাবিহারের পরিবেশটি ভেসে উঠল। বুদ্ধ তথাগতের চরণস্পর্শে সোনা হয়ে আছে যেখানকার মাটি, যেখানকার বাতাসে মিশে আছে তাঁর সম্বোধিবাণী, যেখানকার ধূলিমাটিতে, স্কুপে, তপোবনে, সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রব্রজিত মহিমার কত স্মৃতি।

কিন্তু কোনো পুণ্যস্মৃতির আকর্ষণে ওই মহাপরিনির্বাণ স্থানে মন উধাও হয়নি শীলাবতীর। তিনি সেখানে যাচ্ছেন একজনকে গ্রহণ করবেন বলে, একজনকে কাছে টানবেন বলে। খুব কাছে, একেবারে বুকের কাছে। সেখানকার বহু গাইডের মধ্যে যে ছেলেটা একেবারে স্বতন্ত্র, এতবার

দেখাশোনার ফলে যে ছেলেটা এখন তাঁকে দেখলেই ‘মাদার মাদার’ বলে কাছে ছুটে আসে মুখ খুললে অনর্গল প্রায় শুদ্ধ ইংরেজী বলে, গাল-গল্ল ফেঁদে সাগ্রহে মহাবিহারের ধূলিকণা পর্যন্ত চেনাতে চেষ্টা করে তাঁকে, তারপর বিদায় নেবার আগে মুখের দিকে চেয়ে দুষ্টু-দুষ্টু হাসে, বলে—এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কাটালুম, এতসব দেখালুম, ইউ সুড অ্যাটলিস্ট গিভ মি এ ফাইভ-রুপি নোট মাদারা।

তাকে। তাকেই আনতে যাচ্ছেন শীলাবতী। নিজের অগোচরে আপন মনে আরো বেশি হাসছেন তিনি ছেলেটা যেন তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে, হাসছে মুখ টিপে প্রতিবারের মতোই দুষ্টুমি করে বলছে—মাদার, আই অ্যাম রাহুল, রিমেশ্বার মি!

একরাশ ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল, দেখলেই মন-পাখি ওগুলোর প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠে ফরসা রঙ অযত্নে তামাটে দেখায়, জোড়া ভুরু, টানা চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টি সর্বদা চঞ্চল। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি যেন লেগেই আছে, হাসলে আরো সুন্দর দেখায়। বছর চব্বিশ হবে এখন বয়স, হিসেবে ভুল হবার কথা নয় শীলাবতীর—কিন্তু দেখায় যেন আঠারো-উনিশা খুব লম্বা নয়, একটু রোগা ধরনের, ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনের দিকে একটু ঝোঁক নিয়ে হাঁটে, আর মুখে অনর্গল খই ফোটে।

গেল বারের কথা মনে হতে আরো বেশি হাসি পেল শীলাবতীর। তিন দিন ছিলেন, তিন দিনই মহাবিহারে গিয়েছিলেন স্কুলে পর পর কয়েকদিন ছুটি থাকলে গিয়ে থাকেনা গেল বারের তৃতীয় দিনে রাহুল অন্য দর্শক জুটিয়ে ফেলেছিল তিনি যাবার আগেই তাকে না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। অদূরের কতগুলো ভগ্নস্তূপের ফাঁক দিয়ে ছেলেটাই প্রথম দেখল তাঁকে দেখে তার দল ছেড়ে কাছে এগিয়ে এল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝরল—তুমি আসবে, কাল বলে যাওনি তো মাদার, আই অ্যাম এনগেজড, হাউ-এভার, আ-অ্যাম গিভিং ইউ এ গুড গাইড।

মুখের দিকে চেয়েছিলেন শীলাবতী, হেসেছিলেনও হয়ত একটু আর অল্প ঘাড় নেড়েছিলেন। অর্থাৎ তাতে হবে না।

ছেলেটা বিব্রত হয়েছিল, আবার একটু খুশিও হয়েছিল।

—ওয়েট হিয়ার, লেট মি সি।

একটু বাদে দর্শকদলটিকে অন্যের হাতে গছিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসেছিল।

—কাম অন মাদার, আ-অ্যাম ফর ইউ নাও।

সেদিন শীলাবতী ইচ্ছে করেই ছেলেটাকে জ্বালিয়েছিলেন একটু এখানে যত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এক বছর ধরে তার বিবরণ শুনলেও ফুরাবে না। তাঁর প্রদর্শক যে-গল্পই ফেঁদে বসে, শীলাবতী বাধা দেন, বলেন—সত্যের মধ্যে তুমি গল্প মেশাচ্ছ, আমি তো শুনেছি এটা এই, এটার এই-এই ব্যাপার—

বারকয়েক থমকে গিয়ে ছেলেটা ঈষৎ বিস্ময় মেশানো কৌতুকে নিরীক্ষণ করেছে তাঁকে। — আর ইউ এ হিস্টোরিয়ান মাদার?

ইতিহাসে বিশেষজ্ঞা তিনি, সেটা আগে কখনও প্রকাশ পায়নি। আগে কান পেতে তিনি ছেলেটার কথাগুলো আশ্বাদন করেছেন শুধু, তাৎপর্য খোঁজেননি সেদিনও প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে হাসিমুখে বলেছিলেন—কেন, আমার মতো দর্শককে বোঝাতে গিয়ে খুব সুবিধে লাগছে না বুঝি?

অপ্রতিভ না হয়ে ছেলেটা দিবি হেসেছিল, বলেছিল—তা কেন, তোমাদের ওই শূকনো ইতিহাস আওড়ালে এখানে লোক আসা ছেড়ে দেবে আর আমাদেরও উপোস করে মরতে হবে

—তা বলে লোককে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবে, সত্যি বলবে না?

বড় বিচিত্র জবাব দিয়েছিল ওই দুষ্ট ছেলেটা এখনো কানে লেগে আছে। মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসেছিল আর বলেছিল। এই বানানো গল্পই আমরা সত্যি বলে বিশ্বাস করি, আর লোকেরও বিশ্বাস করতে ভালো লাগে মাদার। ভগবানের মহিমা বলার মধ্যে আবার মিথ্যা কি আছে! তছাড়া, তোমার ওই ইতিহাস যারা লিখেছে, তারা সব নির্জলা সত্যি লিখে গেছে, তাই বা কি করে জানলে?

এরপর শীলাবতী আর একটাও তর্ক তোলেননি।

আবার হাসি পাচ্ছে। বিদায়ের আগে ছেলেটা মুখখানা গম্ভীর করে তুলতে চেষ্টা করে অসঙ্কোচে বলেছিল—তোমার জন্য একটা বড় দল হাতছাড়া করেছি মাদার, দিস টাইম ইউ সুড গিভ মি এ টেন-রুপি নোট।

টাকা আদায়ের বেলায় ছেলে লাজ-লজ্জার ধার ধারে না। ফস ফস করে বলে বসে ছদ্ম বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছিলেন শীলাবতী পাঁচ থেকে একেবারে দশ! কেন, অত টাকা দিয়ে কি হবে?

তক্ষুনি বুঝেছে পাবে। তাই জোর দিয়ে বলেছিল—তোমাদের কাছে আবার অত কি মাদার। কিছু বেশি পেলে একটু ভালো থাকতে পারি, একটু ভালো খেতে পাই, একটু ভালো পরতে পারি—অথচ ও-কটা টাকা তোমাদের কাছে কিছু নয়।

শীলাবতী ওর হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন সেদিন বুকের হাড়-পাঁজর টনটনিয়ে উঠেছিল। আজ হাসছেন আজ নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া শেষ বলেই হাসতে পারছেন। অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলছেন কিছু বলছেন, রক্তে লেগে আছে সুখের স্বাদ, ভালো থাকতে খেতে পরতে চাইবে না কেন? দেখি এবার থেকে কত সুখে থাকতে পারিস তুই, আর তোকে লোকের কাছে হাত পেতে বেড়াতে হবে না।

বাড়ি।

গান্ধীঘের বর্ম-আঁটা কত্রীর বদলে এইদিনে একখানা হাসিখুশি মুখ দেখবে, বাড়ির পরিচারক পরিচারিকা কটিও আশা করেনি হয়ত আরো বিস্মিত হল, কত্রী তাদের ঘরে ডেকে এনে ভারি সদয় মুখে দু মাসের করে মাইনে আগাম দিয়ে বিদায় দিলেন যখন। এই রাত পোহালে তারা অন্য কাজ দেখে নেয় যেন, তিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

জিনিস-পত্র একরকম গোছগাছ করাই ছিল। স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিলেন আর যা থাকল, সকালেই হয়ে যাবে। স্যুটকেস থেকে শীলাবতী তাঁর তরুণ গাইডের ছবিটা বার করে টেবিলে রাখলেন। হাসছেন মুখ টিপে। গাইডই বটে। বাকি জীবনটা ওই ছেলের সর্দারীতে চলতে হবে। ছেলেটাও যেন তাই বুঝেই হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

ছবিটা অনেকদিন আগে শীলাবতী নিজের হাতে তুলেছিলেন ওর পরিচয় সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হবারও আগে ওকে দেখে অনেক সম্ভব-অসম্ভব যখন মনের মধ্যে ভিড় করে আসত, তখন ওকে দেখলে কবেকার কোন বিস্মৃত উৎসে যখন বান ডাকত, তখন ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলে বুকের শুকনো হাড়পাঁজরে যখন সুখের প্রলেপ লাগত, তখন।

তিন বছর আগে এই ছবি যে তিনি তুলে এনেছিলেন সেটা শঙ্কর আচার্যও জানতেন না যিনি অনেক প্রত্যাশীকে বাতিল করে এই গাইড তাঁকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। আর সে-সময়ে কিছু গোপন করার জন্য যিনি সন্তর্পণে এক ছদ্ম গান্ধীর্ষের বিবরে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

ছবিটা তুলে এনে শীলাবতী এই ঘরের এই টেবিলেই রেখেছিলেন। দেখে পরিচিতেরা জিজ্ঞাসা করেছেন, এ কে?...কেউ বা সমনোযোগে দেখে শুধিয়েছেন, ছোট ভাই-টাই কেউ নাকি, অনেকটা আপনার মতোই মুখের আদল—

না, তখনো শঙ্কর আচার্য তাঁকে বলেননি এ কে। কিন্তু মর্মস্থলের অনুভূতি দিয়ে যা বোঝবার শীলাবতী বুঝে নিয়েছিলেন অতিথি অভ্যাগতদের প্রশ্ন এবং মন্তব্য শুনলে আশায় উদ্দীপনায় তাঁর মুখ লাল হত। গান্ধীর্ষের আড়াল নিতে হত তাঁকেও।

শীলাবতীর জীবনে দুটো ঝড় গেছে। একটা ছোট, একটা বড়। যাঁকে কেন্দ্র করে ওই বড় ঝড়, তিনি শঙ্কর আচার্য।

যা হবার কথা নয়, শীলাবতীর জীবনে একে একে তাই হয়েছে। তাই ঘটেছে। ব্লাডপ্রেসারে কাবু দরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের পনের বছরের বিধবা

মেয়ে সসম্মানে এম. এ. পাশ করে নিজের দু পায়ে ভর করে একদিন সোজা হয়ে দাঁড়াবে—সে আশা সেদিন সুদূর স্বপ্নের মতো ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন সত্য হল যখন, তখন এক মর্মান্তিক আঘাতে বুক ভেঙে গেল তাঁরা সেই ভাঙা বুক আর জোড়া লাগেনি।

কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা। তার অনেক আগে ভবিতব্যের কথা। মেয়ে সুশ্রী, চৌদ্দ বছরে বিয়ে দিয়েছিলেন। এক বছর না ঘুরতে ঝড়জলে নৌকাডুবি হয়ে তরতাজা জামাই খোয়ালেন তিনি। পনের বছরের মেয়ের বৈধব্য দেখলেন। তাও সহ্য করলেন।

গঙ্গার গর্ভে যাঁকে হারালেন, তাঁকে ভালো করে চেনা হয়নি শীলাবতীর। কিন্তু প্রায় পনের বছর বাদে এক বিচিত্র গোথূলিতে সেই গঙ্গার বুকেই যে একজনকে পেলেন, তাঁকে একেবারে হেঁটে দিতে কেনোদিনই পারেননি শীলাবতী। আগেও না, পরেও না।

তিনি শঙ্কর আচার্য।

অবস্থাপন্ন, রক্ষণশীল উত্তরপ্রদেশীয় পরিবারের ছেলে। বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বনের প্রচলন।

দূর সম্পর্কের আত্মীয় শীলাবতীদের। শীলাবতীর বাবা তাঁদেরই অনুগৃহীত ছিলেন। একই বাড়িতে এক বিচ্ছিন্ন অংশে থাকতেনা শীলাবতী বিধবা হবার পর সেই বাড়ির কৃতি সন্তান শঙ্কর আচার্যই একটা অবলম্বনের পথ দেখালেন শঙ্কর আচার্য তখন বাইশ তেইশ বছরের তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন বিশেষ। তাঁর আগ্রহে উৎসাহে উদ্দীপনায় হতাশার মধ্যে একটুকরো আলো দেখলেন দুঃখী পরিবারটি শীলাবতীর পড়াশুনা চলতে লাগল।

আচার্য-গৃহে একটা চাপা সংশয় দেখা গেল আরো সাত-আট বছর পরে কুলের গৌরব অমন হীরের টুকরো ছেলে বিয়ে করতে চায় না কেন? শঙ্কর আচার্য তখন অধ্যাপনা করেন। ছোট এক ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু তিনি বিয়ের কথা কানেও তোলেন না। আরো তিন চার বছর বাদে বাড়ির

লোকের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়সেও ছেলেকে বিয়েতে রাজি করানো গেল না।

চেপ্টা শীলাবতীও করেছেন বলেছেন—ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচ রকম ভাবছেন তাঁর বিয়ে করা উচিত। তাঁর জীবনে শঙ্কর আচার্য বিধাতার পরম আশীর্বাদের মতোই এসেছেন, কেউ তাঁকে হেয় চোখে দেখলে তাঁর পরিতাপের সীমা থাকবে না।

শঙ্কর আচার্য এ-কথাও কানে তোলেন নি। প্রথমে বলেছেন, ও-সব ঝামেলা পোয়ানোর সময় নেই তাঁর। পরে সরাসরি বলেছেন, তিনি পৈতৃক সম্পত্তির প্রত্যাশা রাখেন না, বিধবা বিবাহ করলে আপত্তি কি?

শুনে শীলাবতী কানে আঙুল দিয়েছেন। পরে তাঁকে বোঝাতে চেপ্টা করেছেন। কিন্তু কথা তুললে শঙ্কর আচার্য ওই এক কথাই বলেন। শীলাবতীকে বেশি বিরূপ হতে দেখলে বলেন, একটা সমস্যাকে বড় করে তুলে লাভ কি, তার থেকে আমি যেমন আছি থাকতে দাও—বিয়ে না করলেও মানুষের দিন কাটো

তা-ই কাটতে লাগল। এরও তিন বছর বাদে শীলাবতীর শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। আশাতীত ফলের ঘোষণা যেদিন কানে এল, কৃতজ্ঞতায় শীলাবতীর দুচোখ ছলছল করে উঠেছিল। এই সাফল্যের ষোল আনাইকার প্রাপ্য, এ তাঁর থেকে ভালো আর কে জানে?

সেইদিনই শঙ্কর আচার্য এক সময় তাঁকে জানালেন, কিছু আলোচনা আছে। ব্যবস্থামতো এক জায়গায় সাক্ষাৎ হল দুজনার। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। কি ভেবে শঙ্কর আচার্য একটা নৌকো ভাড়া করলেন এই দূরের এলাকায় কেউ তাঁদের চিনবে না। তাছাড়া একটু বাদেই দিনের বিদায়ী আলো নিশ্চিহ্ন হবে।

কিন্তু কথা কিছু হল না। মুখোমুখি দুজনে চুপচাপ বসে রইলেন মাঝি তার ইচ্ছেমতো নৌকা বেয়ে চলল।

অনেকক্ষণ বাদে শীলাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলবে?

শঙ্কর আচার্য হেসে বললেন—অনেক বলব, অনেক বোঝাব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছুই বলার নেই, কিছুই বোঝাবার নেই। যা-ই বলি, ঘুরে ফিরে সেটা এই ভেসে বেড়ানোর কথাই।

সমস্তক্ষণের মধ্যে আর কথা হয়নি। দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন—মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান দুজনে দুজনকে এক-একবার দেখেছেন শুধু।

কিন্তু সেদিন আকাশে ষড়যন্ত্র ছিল বাতাসে জাদুর মোহ ছিল। ভরা জ্যোৎস্নার থালার মততা। চাঁদের বুকে সব-খোয়ানোর ইশারা ছিল সেই জ্যোৎস্না-ধোয়া জলের কলকাকলিতে সর্বনাশা কানাকানি ছিল।

শঙ্কর আচার্য হাত ধরে নৌকা থেকে নামালেন যখন, শীলাবতী তখনো আত্মবিস্মৃত, বিহ্বল। হাতের স্পর্শেও সর্বাঙ্গ থর থর কেঁপে উঠল।

তারপর রাত্রি নিঝুম, নীরব রাত্রি। দরজায় মৃদু শব্দ হল শীলাবতী চমকে উঠলেন। দুই কান উৎকর্ষ। তিনি জানতেন কেউ আসবে। তিনি জানতেন বন্ধ দরজা খুলে দিতে হবে।

খুলে দিলেন।

এই রাতের যৌবন-বাস্তবের আগন্তুককে ফেরাবার সাধ্য তাঁর নেই। ফেরাবার ইচ্ছেও নেই। সেই বিহ্বলতার মধ্যেই একে একে আরো অনেকগুলো রাত কেটে গেল। দিনের অবসানে উন্মুক্ত দুটি হৃদয়ের একটি প্রতীক্ষা। রাতের প্রতীক্ষা।

এর পর শঙ্কর আচার্যই আত্মস্থ হলেন প্রথমে তিনি ঘোষণা করলেন শীলাবতীকে বিবাহ করবেন।

বনেদী রক্ষণশীল সংসারে যেন বাজ পড়ল একটা শঙ্কর আচার্যর বাবা নির্মম হয়ে উঠলেন। এদিকে তেমনি বজ্রাহত হয়ে ছিলেন শীলাবতীর বাবা। তার ওপর বুকে অপমানের শেল বিদ্ধ হল। বৃদ্ধ প্রভু আচার্য বড়ো নির্মম

ভাবে তাঁকে শাসালেন, বিশ্বাসঘাতক বেইমান বললেন, সেই মুহূর্তে মেয়ে নিয়ে তাঁকে দূর হয়ে যেতে বললেন।

সেই মুহূর্তে না হোক, দুদিনের মধ্যে শীলাবতীর বাবা বড়ো আঘাত নিয়ে এই জগৎ-সংসার থেকেই দূর হয়ে গেলেন। ব্লাডপ্রেসারের রোগী, কটুপ্তি শুনতে শুনতেই এক সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন মৃত্যুর দু ঘণ্টা আগে একখানা হাত তুলে কিছু যেন নিষেধ করতে চেষ্টা করেছিলেন শীলাবতীকে। সেটা আর কেউ না বুঝুক শীলাবতী বুঝেছিলেন।

একটা সামান্য চাকরি সংগ্রহ করে শীলাবতী বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন কিন্তু শঙ্কর আচার্য পরিত্যাগ করতে চাননি তাঁকে। স্থির সঙ্কল্প নিয়েই এসেছিলেন। ত্যাজ্যপুত্র হবেন, এতবড় বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত হবেন—বাপের এই ঘোষণারও পরোয়া করেননি। কিন্তু শীলাবতী রাজি হননি শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন—তোমাকে আমি কোনোদিন চিনতে ভুল করিনি, তবু এখানেই এর শেষ হোক।

তাঁকে বোঝানো সম্ভব হয়নি।

শেষ সেখানেই হল না নিজের দেহের অভ্যন্তরেই নতুন বারতार সূচনা উপলব্ধি করলেন কিছুদিন যেতে না যেতো আগন্তুক আসছে। শীলাবতী এইবার বিচলিত হলেন একটু নতুন করে মনস্থির করতে হল আবার শঙ্কর আচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

শুনে শঙ্কর আচার্য আর এক দফা মত বদলাতে চেষ্টা করলেন শীলাবতীরা অনেক অনুরোধ করলেন, অনেক অনুন্য় করলেন, রাগ অভিমান পর্যন্ত করলেন। কিন্তু বিয়েতে রাজি করাতে পারলেন না তাঁকে। শীলাবতীর এক কথা, যে আসছে তার ব্যবস্থার ভার শুধু তুমি নাও, নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও তোমাকেও আমি তার সঙ্গে জড়াতে বলছি না, তোমার অর্থের জোর আছে, অনেক রকম ব্যবস্থাই তোমার পক্ষে সহজ।

যথাসময়ে সন্তান এসেছে। নির্মম শান্ত চিত্তে শীলাবতী আটদিনের ছেলেকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমার

ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। তুমি যে ব্যবস্থা করবে তাই ওর পক্ষে ভালো বলে ধরে নেব।

এর পর অনেকদিন আর শঙ্কর আচার্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। তবু একদিন শীলাবতীর কানে খবর এল একটা শঙ্কর আচার্যের বাবা তাঁকে বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন নাকি তাঁর বিশ্বাস, তাঁর অবর্তমানে ছেলে শীলাবতীকেই ঘরে এনে তুলবো শীলাবতী ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখলেন শঙ্কর আচার্যকে। লিখলেন, আমাকে যদি ভালোই বেসে থাক কোনোদিন, বোকামি করে এত বড় শাস্তি তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে দিও না। আমার কাজের ব্রত পণ্ড কোরো না, কাউকে ঘরে এনে তার প্রতি সুবিচার করলে আমিই সব থেকে খুশি হব!

তারপর শঙ্কর আচার্য বিয়ে করেছেন, খবরটা পাওয়া মাত্র শীলাবতীর বুক থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল যেন।

দু বছর চার বছর বাদে এক-একবার দেখা হয়েছে তাঁদের আশ্চর্যরকম সহজ হতে পেরেছেন দুজনেই। গোড়ায় একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্য এক শিশুর প্রসঙ্গে ঈষৎ কৌতূহল দেখা দিয়েছিল শীলাবতীরা শঙ্কর আচার্য হাসিমুখে বলেছিলেন, জানতে চেও না। তার পক্ষে যা ভালো তাই করেছে।

দশ বারো বছর বাদে শীলাবতী হঠাৎ আর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন— সত্যি আছে, না। গেছে?

—আছে। ভালোই আছে। কিন্তু আজ তোমার দুর্বলতা দেখলে আমি রাগ করব।

শীলাবতী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করেছেন। কঠিন তাড়নায় নিজেকে কর্তব্যের পথে টেনে নিয়ে গেছেন। অবকাশ কখনো চাননি। অবকাশ শত্রু।

বছর তিনেক আগের কথা মহাবিহারে এসেছিলেন সঙ্গে শঙ্কর আচার্য ছিলেন। এই বয়সে নির্লিপ্ত সহজ মেলামেশাটা আরো সহজ হয়েছে।

এত গাইডের মধ্যে শঙ্কর আচার্য খুঁজে পেতে ওই রাহুলকে বার করলেন। ছেলেটা তাঁকে খুব ভালো করে চেনে আর ভক্তিশ্রদ্ধাও করে মনে হল হঠাৎ কি মনে হতে হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচল থেমে আসার উপক্রম শীলাবতীর ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তলে এমন একটা আলোড়ন উঠল কেন তাঁর! এই ঈষৎ চঞ্চল মিষ্টি কচিমুখখানা বড়ো কাছের, বড়ো আকাঙ্ক্ষার এক স্বপ্নের চেনা বলে মনে হল কেন তাঁর! শঙ্কর আচার্যের মুখের অভিব্যক্তি যেন অন্যরকম।

সম্ভাবনাটা সমূলে বাতিল করতে চেষ্টা করলেন শীলাবতী। অসম্ভবই ভাবলেন। কিন্তু ছেলেটাকে ভারি ভালো লাগল তাঁর। চটপটে, ফটফটো মুখে হাসি লেগেই আছে—আর অনর্গল। কথা

সাহস করে গাইড প্রসঙ্গে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না শীলাবতী যা ভাবছেন, সত্যি ততা নয়ই, উল্টে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, তা হয়ত আর গোপন করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু বাড়ি ফিরে একটা অস্বস্তিই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল আবার। শঙ্কর আচার্য বেছে বেছে ওকেই ডাকলেন কেন? সকৌতুকে বার বার তাঁকেই দেখছিলেন কেন? কিছুকাল বাদে আর এক ছুটিতে শীলাবতী একাই এলেন মহাবিহারে। খুঁজে খুঁজে ওই গাইডকেই বার করলেন। দিবি আলাপ জমে উঠল সেবারে।

এরপর মাঝে মাঝেই আসতে লাগলেন তিনি। কয়েকদিনের ছুটি পেলেই আসেন। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাঁকে টেনে টেনে আনো ছেলেটা মাদার মাদার বলে হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ায়। শীলাবতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে ইংরেজি বলে কেন, মাতৃভাষা জানে না?

ছেলেটা হেসে বলেছিল, জানো তবে ছেলেবেলা থেকে মিশনে মানুষ বলে ইংরেজি বলতেই সুবিধে হয় আরো হেসে মন্তব্য করেছিল, তোমাদের মতো শিক্ষিত দর্শকদের কাছে তার কদরও বেশি হয় মাদার।

ধারণাটা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে আসছিল শীলাবতীর। তাঁর ঘরে ওর ছবি দেখেও তো অনেকে জিজ্ঞাসা করছে, কে হয়? তারা তো কিছু কল্পনা করে নি, তারা মিল দেখে কি করে?

আর সহ্য করতে না পেরে শেষে শঙ্কর আচার্যকে চিঠি লিখলেন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তাঁর ধারণা সত্যি কি না।

দিনকয়েক বাদে জবাব এল, সত্যি।

এই কটা দিন অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ছিলেন শীলাবতী। জবাব পাওয়ামাত্র দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখের দিকে ছোঁটাছুঁটি করতে লাগল। আত্মস্থ হওয়ার পর প্রথমেই ভয়ানক রাগ হল শঙ্কর আচার্যর ওপর অন্যের কাছে হাত পেতে জীবিকা অর্জনের পথে ঠেলে দিয়েছেন বলে জীবনে আর যেন ক্ষমা করতে পারবেন না তাঁকে। অথচ মন বলছে, ওই পথে এসেছে বলেই ছেলেটার অমন সুন্দর অমলিন মুখ আজও দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

রাতের ঘুম গেছে শীলাবতীর। আগের দিনের চেয়ে পরের দিন শরীর বেশি খারাপ মনে হয়েছে। কাজে মন দেওয়া শক্ত হয়েছে। জানার পর আর মহাবিহারে যাননি। সব বোঝাবুঝির

অবসান হয়েছে, সব পিছুটান গেছে। এইবার যাবেনা।

মহাবিহারে পৌঁছুলেন যখন, প্রায় বিকেল দুপুরে সামান্য বিশ্রামের সময় বলে ইচ্ছে করেই দেরিতে এলেন একটু

খুঁজতে হল না। হাসিখুশি মুখে সাগ্রহে সে নিজেই এগিয়ে এল। বলল, এবারে তুমি অনেক দিন পরে এলে মাদার।

শীলাবতীও হাসলেন।—হ্যাঁ, তুমি ভালো ছিলে?

—পার-ফেকটলি। বাট অয়্যার ইউ অল রাইট মাদার?—তার দৃষ্টিতে ঈষৎ সংশয়।

শীলাবতীর ইচ্ছে হল দুহাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনেন। হাসিমুখে জবাব দিলেন— ভালোই তো ছিলাম—কেন, তুমি খারাপ দেখছ?

এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে দিয়ে ছেলেটা তড়বড় করে বলল—এস, তোমাকে শোনাব বলেই এবারে অনেক নতুন কিছু স্টাডি করে রেখেছি।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শীলাবতী বললেন—কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে আমার অন্য কিছু কথা ছিল রাহুল।

ছেলেটা হাসিমাখা কৌতুকে দুই-এক মুহূর্ত দেখল তাঁকে। তারপর চিরাচরিত চঞ্চল ব্যস্ততায় বলল কথা পরে শুনব, ওদিকে আলো কমে আসছে, আগে তোমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, নইলে টাকা আদায় করব কোন মুখে দিস টাইম অলসো আই এক্সপেক্ট এ টেন-রুপি নোটা

শীলাবতী সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছেন তার দিকে। বললেন—তার থেকে অনেক বেশিই দেব।

রিয়েলি? হাউ লাকি!—খুশির আতিশয্যে মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল, এসো শিগগির, এরপর কিছু দেখতে পাবে না, আরও আগে আসা উচিত ছিল—

অগত্যা নিরুপায় শীলাবতী অনুসরণ করলেন তাকে। সে পাথর দেখাচ্ছে, মূর্তি দেখাচ্ছে, স্তূপ দেখাচ্ছে, আর মন্তব্য জুড়ছে। কিন্তু শীলাবতীর কানে কিছুই যাচ্ছে না। তিনি শুধু দেখছেন তাকে। খেয়াল হলে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন, অর্থাৎ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন যেন তিনি। একবার শুধু তার কথা শুনে বুকের তলায় মোচড় পড়েছিল একটা। একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাহুল বলছিল, ওটা অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যের স্তূপ—একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল একজন তপস্যার জোরে তথাগতকে পরিতুষ্ট করেছিলেন—ওটা তাঁর স্মৃতি

ঈষৎ অসহিষ্ণু মুখে শীলাবতী বলেছিলেন—তা তো হল, আমার কথা শুনবে কখন?

হাসিমুখেই ছেলেটা নিশ্চিন্ত করেছিল তাঁকে—আমার সঙ্গে থাকলে কেউ তোমাকে যেতে বলবে না, ছটা বাজুক—এই দেখো, মৃগদাব তপোবন। এবারে কত বাড়ানো হয়েছে, আর এত হরিণও তুমি গেলবারে দেখনি মৃগদাবের গল্প জানো তো?

শীলাবতী মাথা নাড়লেন, জানেনা ছেলে আবার মহা-উৎসাহে স্তম্ভ আর মূর্তি আর সংগ্রহ বিশ্লেষণে মেতে গেল।

ছটা বাজল। ছটা পর্যন্তই নির্দিষ্ট মেয়াদ এখানকার বড় করে একটা দম ফেলল ছেলেটা। ঈষৎ শ্রান্ত মিষ্টি করে হাসল তাঁর দিকে চেয়ে বলল—আচ্ছা, এবারে এস গল্প করা যাক।

একটা বড় হলের ভেতর দিয়ে কোথায় নিয়ে চলল তাঁকে জানেন না লোকজন চলে যাওয়ায় ফাঁকা পরিবেশস্তব্ধ লাগছে।

তাঁকে নিয়ে গোটা হল পেরিয়ে আর একটা বড় হল-ঘরে এল সে। সেই ঘরে প্রায় ছাদ-ছোঁয়া বুদ্ধের এক প্রকাণ্ড মূর্তি ছেলেটা সোজা সেই মূর্তির পায়ের কাছে বসে পড়ে সেই পায়ের বশ আরাম করে ঠেস দিল। নরম করে একটু হেসে বলল—কাজ না থাকলে আমি এখানে বসে বিশ্রাম করি ভালো লাগে তুমি এই শিলার ওপর বোস মাদার, তারপর বল কি কথা আছে—

শীলাবতী বসলেন। কি এক অস্বস্তি যেন তাঁকে পেয়ে বসছে। তবু সঙ্কোচ করলে চলবে না। মৃদু শান্ত মুখেই বললেন তোমাকে আমি নিতে এসেছি, আমার সঙ্গে চল, আমার কাছেই থাকবে তুমি।

এটুকু মাত্র বলে নিজেই বিস্মিত তিনি। শোনামাত্র বিষম অবাক হবে ভেবেছিলেন, হতভম্ব হবে ভেবেছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রাহুল হাসছে মিটিমিটি তার মুখে চোখে অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার চিহ্নমাত্র নেই এমন সুন্দর হাসিও শীলাবতী আর যেন দেখেননি।

একটু অপেক্ষা করে খুব সহজ মুখে রাহুল বলল—মাদার, তুমি কে আমি জানি। গেল বারে মিস্টার আচার্য বলেছেন। আমার বাবা কে বলেননি, কিন্তু

তোমাকে তিনি চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি একদিন এই ইচ্ছে নিয়ে আসবে
জেনেই হয়ত তিনি জানিয়ে রাখা দরকার মনে করেছিলেন—

আশায় আশঙ্কায় শীলাবতীর সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলি কাঁপছে থরথর করে
জীবনের চরম কথা অথবা পরম কথা—যা হোক একটা কিছু যেন তিনি
শুনবেন এক্ষুনি।

বুদ্ধের মসৃণ পায়ের দিকটায় হাত বুলোতে বুলোতে খুব মিষ্টি করেই রাহুল
আবার বলে গেল —দেখো মাদার, জন্মের পর থেকে এত বড় বঞ্চনারও
এতটুকু দাগ লাগেনি যাঁর দয়ায়, এই বয়সে তাঁর পায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে
নিয়ে গিয়ে আজ আর কতটুকু আশ্রয় তুমি আমাকে দিতে পারো বলো।
তুমি কষ্ট পেও না, আমি খুব ভালো আছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে
গিয়ে আমাকে তুমি নিরাশ্রয় করতে চেও না মাদার।

উঠল। শান্ত মুখে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

শূন্য ঘর। ...সমুন্নত বিশাল-বক্ষ প্রসন্ননেত্র শিলাময় অমিতাভ মূর্তি।

সামনে চিত্রার্পিতা শীলাবতী।